ঔপনিবেশিক বাংলায় মুসলিম নারী জাগরণে নবাব ফয়জুন্নেসা চৌধুরানীর ভূমিকা

রৌসনারা খাতুন
সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ,
বাসন্তীদেবী কলেজ
Email: rousanarak@gmail.com

সারসংক্ষেপ :

ঊনবিংশ শতকে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির উদ্যোগে ভারতবর্ষে পাশ্চাত্য শিক্ষার বিস্তার ঘটে। এরপর পাশ্চাত্য শিক্ষার অভিঘাতে বাংলায় নবজাগরণের সূচনা হয়। মুসলমান শাসকদের পরাজিত করে ব্রিটিশরা ক্ষমতা দখল করায় প্রথমদিকে মুসলমান সমাজ পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতা বর্জন করে। অন্যদিকে উনিশ শতকের প্রথমার্ধ থেকেই সরকারি চাকুরীতে ইংরেজি বাধ্যতামূলক হয়ে যাওয়ায় মুসলমান সমাজ শিক্ষা-দীক্ষা ও সরকারি চাকুরীতে হিন্দুদের তুলনায় পিছিয়ে পড়ে। এই পশ্চাৎপদতার জন্য অনেকে হিন্দুদের আবার কেউ কেউ ব্রিটিশ সরকারকে দায়ী করেন। এই পরিস্থিতিতে তদানীন্তন ব্রিটিশ সরকার মুসলমানদের উন্নয়নের জন্য কিছু বিশেষ নীতি গ্রহণ করে। আবার মুসলমান সমাজের মধ্য থেকে অনেকে এগিয়ে এসে সংবাদপত্রে লেখালেখি ও একাধিক সংগঠন তৈরির মাধ্যমে জনগণকে সচেতন করে তোলা এবং কলেজ ও বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শিক্ষার প্রসার ইত্যাদি সমাজ উন্নয়নমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করেন। এই সময় মুসলিম নারীদের অবস্থা ছিল খুবই শোচনীয়। অবরোধ প্রথার বেড়াজালে তাদের জীবন আবদ্ধ থাকত। উনিশ শতকের মুসলমান সমাজের পুরুষ প্রতিনিধিরা নারী মুক্তি নিয়ে মাথা ঘামাতেন না। পুরুষদের শিক্ষা-দীক্ষা নিয়েই তাঁরা চিন্তিত ছিলেন। এসব সত্ত্বেও নারী জাগরণের পথ থেমে থাকেনি। অনেক সময় মেয়েরা নিজেরাই নিজেদের মুক্তির জন্য এগিয়ে এসেছেন। এমনই একজন পথিকৃৎ মুসলিম নারী নবাব ফয়জুন্নেসা চৌধুরানী। যিনি একদিকে ছিলেন সুদক্ষ জমিদার অন্যদিকে অত্যন্ত নিষ্ঠা সহকারে সাহিত্যচর্চা করে বাংলা ভাষায় একাধিক সাহিত্য গ্রন্থ রচনা করেন। ফয়জুন্নেসার লেখা 'রূপজালাল' বাঙালি মুসলমান নারীর লেখা প্রথম পূর্ণাঙ্গ সাহিত্য গ্রন্থ। শিক্ষার বিস্তারের উদ্দেশ্যে তিনি নিজ জমিদারি এলাকা কুমিল্লায় ছেলে ও মেয়ে উভয়ের জন্য পৃথক পৃথকভাবে একাধিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছেন। এইজন্য নবাব ফয়জুন্নেসা চৌধুরানীকে বাংলায় মুসলিম নারী জাগরণের অগ্রদূত বলা হয়।

সূচক শব্দ :

উনিশ শতক, মুসলমান সমাজ, অনগ্রসরতা, নারীমুক্তি, নবাব ফয়জুন্নেসা চৌধুরানী।

ঔপনিবেশিক বাংলায় মুসলিম নারী জাগরণে নবাব ফয়জুন্নেসা চৌধুরানীর ভূমিকা

নারী মাত্রই প্রান্তিক, পুরুষের সহধর্মিণী। পুরুষ যখন শিকার করেছে, যুদ্ধ করেছে, প্রতিহত করেছে শত্রুর আক্রমণ, নারী সামলেছে সংসার। সন্তানের জন্ম দিয়েছে। দিয়েছে প্রেম-প্রীতি-ভালোবাসার আশ্রয়। পুরুষের পরিচয়ে পরিচিত হওয়াকেই জীবনের পরমার্থ মেনেছে নারী।[১] নবাব ফয়জুন্নেসা চৌধুরানী একজন নারী ব্যক্তিত্ব যিনি পিতা বা স্বামীর পরিচয়ে নয়, নিজ আত্মপরিচয়ে পরিচিত হয়েছেন এবং ব্যতিক্রমী হিসেবে ইতিহাসে স্থান করে নিয়েছেন। 'ঢাকা প্রকাশ' পত্রিকায় তাঁর গুণাবলী সম্পর্কে মন্তব্য করে লেখা হয়, 'আমাদিগের পূর্ব বাঙ্গালার একটি মুসলমান মহিলা রত্ন'।[২] উনিশ শতকে দাঁড়িয়ে অনগ্রসর মুসলমান সমাজের একজন হয়েও থেমে থাকেননি তিনি, বরং সম্পূর্ণ একক কৃতিত্ব ও মহিমায় নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। ফয়জুন্নেসা ছিলেন একজন সুদক্ষ জমিদার, একাধিক বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা এবং ঔপনিবেশিক বাংলার প্রথম মুসলমান মহিলা সাহিত্যিক।

বাংলায় মুসলমান নারীর জাগরণে ফয়জুন্নেসা চৌধুরানীর ভূমিকা পর্যালোচনা করতে গেলে উনিশ শতক সম্পর্কে ও উনিশ শতকের মুসলমান সমাজ সম্পর্কে আলোকপাত করা দরকার। সাধারণভাবে উনিশ শতক বাংলায় নবজাগরণের শতক বলেই পরিচিত। এই নবজাগরণ হিন্দু সমাজকে বিশেষভাবে এগিয়ে দেয়, অপরদিকে বাংলার দ্বিতীয় সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের মনোজগতে তার ঢেউ আছড়ে পড়ে কিছুটা দেরিতে। গঙ্গাসাগরে সন্তান বিসর্জন, সতীদাহ, বিধবাবিবাহর বিরুদ্ধতা বা কৌলীন্য প্রথার মত কুসংস্কার মুসলমান সমাজে ছিল না। কিন্তু ইংরেজি শিক্ষার প্রতি মুসলমান সমাজের বিরূপতা ও কঠোর মনোভাব সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায়কে আধুনিকতা থেকে অনেক পিছনে ঠেলে দেয়। নারী সমাজের অবস্থা ছিল আরও দুর্বিষহ। এই সময় মুসলিম নারীরা অন্তঃপুরে পর্দার অন্তরালে ধর্মীয় শিক্ষা লাভ করতেন। মুসলিম সমাজের শিক্ষিত পুরুষদের রক্ষণশীল মানসিকতা, ধর্মীয় নিষেধাজ্ঞা ও পর্দাপ্রথার কঠোরতা মুসলিম নারী সমাজকে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করেছিল।[৩] গোলাম মুরশিদ লিখেছেন, অভিজাত পরিবারের মেয়েরা কঠোরভাবে পর্দা প্রথা মেনে চলত, মুখাবরণের ফলে তারা নিঃসঙ্গ হয়ে থাকত।[৪] বেগম রোকেয়া শাখাওয়াত হোসেন-এর লেখা 'অবরোধবাসিনী' গ্রন্থ থেকে জানা যায় পাঁচ বছর বয়স থেকেই ছোট্ট রোকেয়াকে পর্দা করতে হত। মুসলমান সমাজের একাংশ আবার মনে করতেন, লেখাপড়া শিখলে মেয়েদের চরিত্র নষ্ট হয়ে যাবে। লিখতে পড়তে শিখলে, প্রেমপত্র লিখে পরপুরুষকে তারা আহ্বান জানাবে।[৫] ধর্মহানির ভয়ে মেয়েরা তো দূরে থাক মুসলিম ছেলেরা পর্যন্ত মিশনারি স্কুলে যেত না। বাংলা ভাষা তারা শিখতো না, কারণ মনে করা হত বাংলা ভাষা হিন্দুদের ও ইংরেজি কাফেরদের বুলি।[৬] উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে বাঙালি মুসলমানের নতুন যাত্রা শুরু হয়।[৭] ইংরেজি ভাষা ও পাশ্চাত্যবিদ্যা শিক্ষার মধ্য দিয়েই ধীরে ধীরে মুসলমান সমাজ নবচেতনায় জাগ্রত হয়। এই নবচেতনা জাগ্রত করতে যাঁরা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন ফয়জুন্নেসা চৌধুরানী তাঁদের মধ্যে অন্যতম।

ফয়জুন্নেসা চৌধুরানী ১৮৩৪ খ্রিস্টাব্দে পূর্ববঙ্গের কুমিল্লা জেলার হোমনাবাদ পরগণার লোকসামের অন্তর্গত পশ্চিমগাঁও-এ এক ধনী অভিজাত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা ছিলেন হোমনাবাদের জমিদার

জনাব আহমদ আলি চৌধুরী এবং মাতা আরফান্নেসা চৌধুরানী। অভিজাত মুসলিম পরিবারের প্রথা অনুযায়ী বাইরের কোনো পুরুষের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ ছিল না। ফয়জুন্নেসা সেই অর্থে প্রথাগত শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন না। অন্দরমহলে থেকে তাজউদ্দিন নামক জনৈক গৃহশিক্ষকের তত্ত্বাবধানে তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন হয়। উর্দু, বাংলা, সংস্কৃত ও ফারসি ভাষায় তিনি অসামান্য ব্যুৎপত্তির অধিকারী ছিলেন।[৮] মাহমুদ গাজি নামক দূর সম্পর্কের আত্মীয়ের সঙ্গে খুব অল্প বয়সেই ফয়জুন্নেসার বিবাহ দেওয়া হয়। সপত্নী থাকার কারণে তাঁর দাম্পত্য জীবন সুখের হয় নি, যার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি বিবাহবিচ্ছেদ ও পিতার বাড়িতে প্রত্যাবর্তন। পিতৃগৃহে ফিরে আসার পরবর্তী জীবন তিনি যেভাবে কাটিয়েছিলেন তা সেই সময়কার অন্য মুসলিম মহিলারা কল্পনাও করতে পারত না। After breakfast she would go to the estate office, where she would first dispense with the musafirkhana (guest house) accounts and then take up the estate records.[৯] ইতিমধ্যে তিনি দুই কন্যা সন্তানের জন্ম দিয়েছেন এবং তাঁর পিতা পরলোক গমন করেন। তবে অনুমান করা হয় ফয়জুন্নেসার প্রকৃত পড়াশোনার শুরু বাপের বাড়ি ফিরে আসার পর। সমস্ত বাধা বিপত্তি দূর করে নিজের বাড়িতে টোল খুলেছিলেন সংস্কৃত ভাষা শেখার জন্য। সেই সময়ে দাঁড়িয়ে এই সিদ্ধান্ত কত বড় বিদ্রোহ তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

যাই হোক পিতার মৃত্যুর পর ইসলামিক আইন অনুযায়ী উত্তরাধিকার সূত্রে ফয়জুন্নেসা পিতার জমিদারির এক অংশ লাভ করেন। তবে ঠিক কবে থেকে তিনি জমিদারি পরিচালনার দায়িত্ব পান সে সম্পর্কে বিতর্ক আছে। বাংলাপিডিয়া অনুযায়ী তিনি ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে জমিদারি শুরু করেন। আবার কোনও কোনও গবেষকের মতে, ১৮৭০-এর পর থেকেই ফয়জুন্নেসা জমিদারি দেখাশোনার কাজটি শুরু করেন।[১০] তৎকালীন বাংলায় জমিদার হিসেবে আরও কয়েকজন নারী দায়িত্ব পালন করেছেন কিন্তু ব্রিটিশ ভারতে নবাব উপাধি পাওয়া প্রথম ও একমাত্র মহিলা জমিদার ফয়জুন্নেসা চৌধুরানী। তিনি ছিলেন একজন প্রজাহিতৈষী জমিদার। জনহিতৈষণার পুরস্কার স্বরূপ মহারানি ভিক্টোরিয়া ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দে তাঁকে নবাব উপাধিতে ভূষিত করেন।[১১] তৎকালীন জেলা ত্রিপুরার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মি. ডগলাস রাস্তাঘাট সংস্কারের জন্য অর্থ সংকটে পড়লে ফয়জুন্নেসা তাঁকে পঞ্চাশ হাজার টাকা অর্থ দিয়ে সাহায্য করেন। কিছুদিন পরে জেলাশাসক ডগলাস পঞ্চাশ হাজার টাকা সুদ সহ ফেরত দিতে চাইলে ফয়জুন্নেসা প্রাপ্য অর্থ নিতে অস্বীকার করে জানান, যে অর্থ তিনি জনকল্যাণের জন্য দান করেছেন তা ফেরত নেওয়া তাঁর পক্ষে অসম্ভব। মি. ডগলাস ফয়জুন্নেসার এই অবদানের কথা মহারানির গোচরে আনলে ইংল্যান্ডের তরফ থেকে তাঁকে 'বেগম' উপাধি দেওয়া হয়। কিন্তু তিনি ব্রিটিশ সরকারের দেওয়া 'বেগম' উপাধি গ্রহণ করেন নি। ফয়জুন্নেসার যুক্তি ছিল মহিলা জমিদার হওয়ায় এমনিতেই বেগম হিসেবে তাঁর পরিচিতি ও সুনাম আছে।[১২] সুতরাং, এই উপাধি তাঁর জন্য আলাদা কোনও গৌরব আনবে না। জানা যায় যে, ফয়জুন্নেসা ব্রিটিশ প্রদত্ত 'বেগম' উপাধি দু-দুবার প্রত্যাখ্যান করেন। অবশেষে ভিক্টোরিয়ার নির্দেশে মি. ডগলাসের উপস্থিতিতে আড়ম্বরপূর্ণ এক সরকারি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তাঁকে হীরাখচিত একটি পদক, রেশমি চাদর ও সার্টিফিকেটসহ 'নবাব' মর্যাদায় ভূষিত করা হয়। এইভাবে ফয়জুন্নেসার মহানুভবতা ও জনহিতকর কাজের স্বীকৃতি শুধু দেশে নয়, সুদূর ইংল্যান্ডেও ছড়িয়ে পড়ে।[১৩]

মেজাজে জমিদার হলেও মনে প্রাণে তিনি ছিলেন সাহিত্যের একনিষ্ঠ অনুরাগী। ফয়জুন্নেসার জমিদারী সত্তা কখনও তাঁর বিদ্যানুরাগ ও সাহিত্যচর্চায় বাধা সৃষ্টি করেনি। তাঁর লেখায় মুসলমান সমাজ ও নারী জাতির অন্ধকারাচ্ছন্ন অবস্থার কথা বিশেষভাবে উঠে এসেছে। তিনি মোট চারটি গ্রন্থ রচনা করেন, যথা– 'রূপজালাল', 'তত্ত্ব ও জাতীয় সংগীত', 'সংগীত সার' এবং 'সংগীত লহরী'।[১৪] শিমাইল দেশের রাজপুত্র জালাল-এর সঙ্গে রূপবতী কন্যা রূপবানুর প্রণয় কাহিনী রূপজালালের মূল বিষয়বস্তু।[১৫] চম্পূকাব্য শৈলীতে লেখা এটি একটি আত্মজীবনীমূলক সাহিত্যগ্রন্থ। 'বলি অন্যের কাহিনী' বলে আখ্যান শুরু করলেও স্বামীপ্রেম ও দাম্পত্য জীবনের অশান্তি, বিচ্ছেদ বর্ণনা কালে মনে হয়, এসবই আসলে ফয়জুন্নেসার জীবনের ছায়া। 'রূপজালাল' পড়লে বোঝা যায়, তাঁর অন্তর্জগত ছিল রোমান্সে ভরপুর। এই গ্রন্থটি রচনার ক্ষেত্রে তিনি কুমিল্লার ব্রাহ্ম নেতা কালিপ্রসন্ন ঘোষের দ্বারা বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দের ১০ই ফেব্রুয়ারি ঢাকার গিরীশ প্রেস থেকে গ্রন্থটি প্রকাশিত হলে ফয়জুন্নেসা বাংলা সাহিত্যের প্রথম মুসলিম নারী গ্রন্থকর্ত্রী হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন। 'রূপজালাল' সম্ভবত বাংলার একজন মুসলিম মহিলা কর্তৃক রচিত একটি পূর্ণাঙ্গ সাহিত্যকর্ম। ঠিক এই বছরেই বাংলার প্রথম মহিলা ঔপন্যাসিক স্বর্ণকুমারী দেবীর 'দীপনির্বাণ' উপন্যাসটি কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়।[১৬] সোনিয়া নিশাত আমিন তাঁর গবেষণা গ্রন্থ 'The World of Muslim Women in Colonial Bengal, 1876-1939'-তে উল্লেখ করেছেন, "In 1876 Nawab Faijunnesa Chaudhurani's Rupjalal, the first full length book by a Muslim woman in Bengal". ঔপনিবেশিক বাংলায় এর আগে আর কোনও মুসলিম নারীর লেখা বই আকারে প্রকাশিত হয়নি। ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দে বাংলা প্রেস থেকে প্রকাশিত হয় তাঁর ধর্ম ও রাজনীতি বিষয়ক কাব্যগ্রন্থ 'তত্ত্ব ও জাতীয় সংগীত'। বাকি গ্রন্থ দুটি এখন দুষ্প্রাপ্য। এই গ্রন্থ দুটি থেকে লেখিকার সংগীত প্রীতির বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। সেই সময় মুসলিম পরিবারে সংগীতের প্রতি ভালোবাসা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। জমিদার পরিবারে বাংলা সাহিত্যচর্চার দৃষ্টান্ত এই প্রথম। নিয়মিত সাহিত্যচর্চার মধ্য দিয়ে মুসলমান সমাজের মেয়েদের কাছে দৃষ্টান্ত রেখেছেন। সুতরাং বলা যায় সাহিত্য সাধনায় ফয়জুন্নেসার হাত ধরেই বেগম রোকেয়ার আবির্ভাব ঘটেছে।[১৭]

ফয়জুন্নেসা মনে করতেন আধুনিক শিক্ষার প্রসার ব্যতীত দেশ তথা জাতির সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সম্ভব নয়। Faizun felt that women must be by the side of men in the path to modernity.[১৮] এই ধারণার দ্বারা চালিত হয়ে তিনি কুমিল্লা জেলায় তিন ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তৈরি করেন। এগুলি হল যথাক্রমে ১) ধর্মীয় শিক্ষার জন্য মাদ্রাসা, ২) নারী শিক্ষার জন্য বালিকা বিদ্যালয় ও ৩) ছেলেদের জন্য বয়েজ স্কুল। ধর্মীয় শিক্ষার প্রসারের জন্য ফয়জুন্নেসা তাঁর নিজ বাসভূমি পশ্চিমগাঁও-এ একটি অবৈতনিক মাদ্রাসা তৈরি করেন। ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে এটি 'Higher Secondary Islamia College'-এ রূপান্তর লাভ করে। উচ্চ মাধ্যমিক ইসলামিয়া কলেজটি ১৯৬৫ তে এসে ডিগ্রি কলেজে পরিণত হয়। মাদ্রাসাটি অন্যত্র স্থানান্তরিত হয়ে কুমিল্লা অঞ্চলে আজও ধর্মীয় শিক্ষাদানের কাজ করে চলেছে। মক্কাতে প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসা-ই-সওলাতিয়া ও ফোরকানিয়া মাদ্রাসার ব্যয়ভার বহনে সহায়তা করেন।[১৯] পাশাপাশি নিজ জমিদারি এলাকার ভাউকসার, ভাটরা, ছাতারপাইয়া, মানিকমুড়া এবং বাংগড্ডা মৌজায় ছেলেদের জন্যও একাধিক প্রাথমিক বিদ্যালয় তৈরি করেন।[২০] 'Badrunnesa High School for Boys' প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে কন্যা বদরুন্নেসা

তাঁকে অর্থ দিয়ে সাহায্য করেছিলেন। Middle English School হিসেবে শুরু হলেও ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে এটি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে High School-এর মর্যাদায় উন্নীত হয়। ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে কুমিল্লায় কলেজ প্রতিষ্ঠার সময় ফয়জুন্নেসা মোটা অঙ্কের অর্থ দান করেন।

বেগম রোকেয়ার আগে উপমহাদেশের মুসলমান মেয়েদের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ফয়জুন্নেসা চৌধুরানীই প্রথম উপলব্ধি করেন। নিজে পর্দাপ্রথার বেড়াজালে থাকলেও মেয়েদের জন্য আধুনিক শিক্ষার অপরিহার্যতা অনুভব করেছিলেন। তাই নারী শিক্ষার প্রসারের জন্য কুমিল্লা শহরেই মেয়েদের জন্য তিনি নানুয়াদীঘি ও কান্দিরপারে দুটি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। নানুয়াদীঘিতে প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়টি বর্তমানে শৈরানী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় নামে বিদ্যমান। J. Webster তাঁর 'East Bengal District Gazetteers' গ্রন্থে ১৯০৮-০৯ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ কান্দিরপারে প্রতিষ্ঠিত প্রাথমিক বিদ্যালয়টিকে 'the one middle vernacular school' হিসাবে উল্লেখ করেছেন। এরপর তাঁর উদ্যোগে কুমিল্লা শহরে নানুয়াদীঘির পাড়ে পাঁচ একর জমির উপর ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে নবাব ফয়জুন্নেসা উচ্চ ইংরেজি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। এই বিদ্যালয়টির সঙ্গে মেয়েদের থাকার জন্য হোস্টেলের ব্যবস্থা ছিল। তাঁর জমিদারির আয় থেকে হোস্টেলের ব্যয় নির্বাহ করা হত। এছাড়া ছাত্রীদের উৎসাহিত করার জন্য মাসিক বৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থাও করা হয়। নবাব ফয়জুন্নেসা নিজে বোরখা পরে পালকিতে চড়ে ঘরে ঘরে গিয়ে মেয়েদের তাঁর বিদ্যালয়ে পাঠানোর জন্য অভিভাবকদের অনুরোধ করতেন।[২১] প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ভারতে মুসলিম নবজাগরণের অগ্রদূত স্যার সৈয়দ আহম্মদ খান কর্তৃক পাশ্চাত্য শিক্ষার উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত আলীগড় অ্যাংলো ওরিয়েন্টাল কলেজ প্রতিষ্ঠার দুবছর আগেই তিনি নারীদের জন্য পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত মুসলমান সমাজের পুরুষ প্রতিনিধিরাও তখন পর্যন্ত নারী শিক্ষার ব্যাপারে দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন। ১৮৮০-৮১ খ্রিস্টাব্দের সরকারি প্রতিবেদন অনুযায়ী বিদ্যালয়টি 'The best girls' school' বলে প্রশংসিত হয়। এই উচ্চ বিদালয় প্রতিষ্ঠার ২৮ বছর পরে ১৯১১ সালে বেগম রোকেয়ার শাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৩১ সালে শাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ে পরিণত হবার ৫৮ বছর আগে নবাব ফয়জুন্নেসা নিজ উদ্যোগে, নিজ জমিদারিতে মুসলিম মেয়েদের জন্য উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয় স্থাপন করার দুঃসাহস দেখান।[২২] এসব সত্ত্বেও বিদ্যালয়ে মুসলিম ছাত্রীদের দেখা যায়নি।[২৩] বিশ শতকের প্রথম দশক পর্যন্ত হিন্দু ও ব্রাহ্ম পরিবারের মেয়েরাই অধিক পরিমাণে এখানে পড়াশুনা করত। জাতি-ধর্ম নির্বিশিষে সবার জন্য এই বিদ্যালয়ের দ্বার উন্মুক্ত ছিল। এটি ছিল বাঙালি মুসলমান নারীর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত প্রথম উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়। ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে কুমিল্লায় কলেজ প্রতিষ্ঠার সময় ফয়জুন্নেসা মোটা অঙ্কের অর্থ দান করেন। সুতরাং মুসলমান মেয়েদের স্কুল শিক্ষার তিনিই পুরোধা, নারী শিক্ষার ইতিহাসে তিনিই এক নবযুগের সূচনা করেছিলেন।[২৪]

শিক্ষার বিস্তারের ক্ষেত্রে একাধিক উদ্যোগ গ্রহণ ব্যতীত জনস্বাস্থ্যের উন্নতিতে ফয়জুন্নেসার অবদান বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এই উদ্দেশ্যে লাকসামে নিজ খরচায় একটি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন ও পরিচালনা করেন। ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে কুমিল্লা শহরে ফয়জুন্নেসার উদ্যোগে শুধুমাত্র মহিলাদের জন্য 'জেনানা হাসপাতাল'

প্রতিষ্ঠা হয়। বর্তমানে এটি কুমিল্লা সদর হাসপাতালের 'নবাব ফয়জুন্নেসা ফিমেল ওয়ার্ড' নামে পরিচিত।[২৫] এ বিষয়ে উল্লেখ করে সমসাময়িক একজন পাশ্চাত্য লেখক তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন যে, "At Comilla the Nawab Faizunnesa Saheba and three other ladies jointly offered the whole amount required for the building of a hospital".[২৬] এছাড়া তিনি লেডি ডাফরিনের সহযোগিতায় বিলেত থেকে ডাক্তার, নার্স এনে এখানে উন্নত পদ্ধতিতে চিকিৎসা করানোর ব্যবস্থা করেন। উনিশ শতকের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে মেয়েদের সুস্বাস্থ্যের কথা ভাবা সত্যিই বিস্ময়কর ঘটনা। নারী জাতির স্বাস্থ্যের উন্নতি ব্যতীত একটি সুস্থ ও সুন্দর প্রজন্ম তৈরি করা প্রায় অসম্ভব একথা বুঝতে ফয়জুন্নেসার কোনো অসুবিধা হয়নি। দূর-দূরান্তে যাতায়াতের সময় পরিশ্রান্ত ও অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিদের সাহায্য, সেবা ও আশ্রয় দান করার জন্য নিজের বাড়িতে মুশাফিরখানা তৈরি করেন। এমনকি মক্কায় হজ করতে গিয়ে নিজ অর্থ ব্যয়ে প্রায় শুকিয়ে যাওয়া নহরে জোবায়দা খালটি পুনঃখনন করিয়েছিলেন। এছাড়া ফয়জুন্নেসা নিজের বাসভবনের পাশে দশ গম্বুজ বিশিষ্ট একটি মসজিদ তৈরি করেন। এখানে কোরআন শিক্ষার সুব্যবস্থা ছিল। ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে বহুবিধ কর্মযজ্ঞে সামিল এই মহামানবী অমৃতলোকে যাত্রা করেন। মৃত্যুর পরে ফয়জুন্নেসার ইচ্ছা অনুসারে তাঁর সকল সম্পত্তি ওয়াকফ করা হয়।[২৭]

উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে একথা স্পষ্ট যে, পূর্ব বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে নারী শিক্ষার বিস্তারে নবাব ফয়জুন্নেসা চৌধুরানী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ধনী ও অভিজাত পরিবারে জন্মগ্রহণ করলেও আর পাঁচটা সাধারণ নারীর মুক্তির চিন্তা তাঁকে ব্যাকুল করেছে। অন্যান্য জমিদারদের মত শোষণ নয়, প্রজাকল্যাণ সাধনকেই তিনি জীবনের ব্রত হিসেবে নিয়েছেন। সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য একদিকে রাস্তাঘাট নির্মাণ, খাল খনন, সরাইখানা স্থাপন, দাতব্য চিকিৎসালয় তৈরি ইত্যাদি জলকল্যাণমুখী নীতি গ্রহণ করেছেন অন্যদিকে আধুনিকতার সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষার জন্য পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসারের উদ্দেশ্যে ছেলে-মেয়ে উভয়ের জন্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছেন। তবে নারী শিক্ষার প্রসার ও নারী স্বাস্থ্যের উন্নতির বিষয়টিকে তিনি সর্বদাই অধিকতর প্রাধান্য দিয়েছেন। পূর্ববঙ্গের প্রত্যন্ত গ্রামে জন্মগ্রহণ, বিবাহবিচ্ছেদ, স্বামীবিচ্ছিন্ন জীবনে দুই কন্যা সন্তানকে নিয়ে জীবন সংগ্রাম কোনও কিছুই তাঁকে দমিয়ে দিতে পারে নি। শুধুমাত্র আত্মবিশ্বাসকে সম্বল করে ফয়জুন্নেসা ব্রিটিশ সরকারের কাছ থেকে নবাব অভিধায় ভূষিত হয়েছেন এবং পুরুষতন্ত্রকে অগ্রাহ্য করে অগণিত মুসলমান নারীর এগিয়ে যাবার পথ প্রস্তুত করেছেন। তাই প্রকৃত অর্থেই নবাব ফয়জুন্নেসা চৌধুরানী ছিলেন 'a precursor to Modern women'।

তথ্য সূত্র-

১। চক্রবর্তী, বাসবী (সম্পাদিত), নারী পৃথিবী ঃ বহুস্বর, উর্বী প্রকাশন, ২০১১, পৃষ্ঠা-১০৬।

২। ঢাকা প্রকাশ, ৫ মাস, ১২৮১।

৩। হোসেন, আনোয়ার, স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার মুসলিম নারী (১৮৭৩-১৯৪৭), কলকাতা, প্রগতিশীল প্রকাশক, ২০০৯, পৃষ্ঠা-৬৭।

৪। Murshid, Ghulam, Reluctant and Debutante : Response of Bengali Women to Modernization, 1849-1905, Rajshahi, Rajshahi University Press, 1983, Page-12.

৫। বসু, স্বপন (সম্পাদিত), উনিশ শতকে স্ত্রীশিক্ষা, কলকাতা, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, তৃতীয় সংস্করণ, মাঘ, ১৪২১, পৃষ্ঠা-২২।

৬। শামসুল হক, মাহমুদ; বাঙালি নারী - হাজার বছরের ইতিহাস, ঢাকা, হাতে খড়ি প্রকাশনী, ২০০০, পৃষ্ঠা-২৬৬।

৭। আহমেদ, ওয়াকিল; উনিশ শতকে বাঙালি মুসলমানদের চিন্তা ও চেতনার ধারা, কলকাতা, বিশ্ব বঙ্গীয় প্রকাশন, ২০১৯, পৃষ্ঠা-৪৪।

৮। Nishant Amin, Sonia; 'The World of Muslim Women in Colonial Bengal, 1876-1939', E.J. Brill, Leiden, New Yord, 1996, page-149

৯। Abdul Quddus, Md.; Introduction, Rupjalal by Faizunnesa Chaudhurani, Dhaka, Bangla Academy, reprint 1984, page - x.

১০। https://www.bbc.com/bengali/news-59298002.

১১। https://www.bbc.com/bengali/news-59298002.

১২। Abdul Quddus, Md.; Ibid, page - v.

১৩। বেগম, সালেহা; পথিকৃৎ মুসলমান নারী, কলকাতা, প্রগতিশীল প্রকাশক, ২০১৩, পৃষ্ঠা-২৮।

১৪। শতবার্ষিকী স্মরণিকা, কুমিল্লা ফয়জুন্নেসা উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, কুমিল্লা, ১৯৭৫, পৃষ্ঠা-৩৩।

১৫। আহমেদ, ওয়াকিল; তদেব, পৃষ্ঠা-৩২৫।

১৬। Nishat Amin, Sonia; Ibid, Page-215.

১৭। দৈনিক সংগ্রাম পত্রিকা, সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদুল হক, নবাব ফয়জুন্নেসা ঃ সাহিত্য সাধনা ও নারী জাগরণ, ১৬ই নভেম্বর, ২০১০।

১৮। Nishat Amin, Sonia; Ibid, Page-149.

১৯। পুরকায়স্থ, নিবেদিতা; মুক্তমঞ্চে নারী, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃষ্ঠা-৫০।

২০। বেগম, রওশন আরা; নবাব ফয়জুন্নেহা ও পূর্ববঙ্গের মুসলমান সমাজ, ঢাকা, বাংলা একাডেমি, ১৯৯৩, পৃষ্ঠা-২৭।

২১। বসু, পূরবী; বাংলার স্মরণীয় নারী, ঢাকা, অন্যপ্রকাশ, ২০১৬, পৃষ্ঠা-১০৪।

২২। বেগম, রওশন আরা; তদেব, পৃষ্ঠা ৩৭-৩৯।

২৩। রফিক, আহমদ; নারী প্রগতির চার অনন্যা, কলকাতা, কথা, ২০০৯, পৃষ্ঠা-২০।

২৪। বাহার জামান, সেলিনা; কালান্তরে নারী, নবাব ফয়জুন্নেসার জীবন ও সাহিত্যকর্ম, সংবাদ পত্রিকা, ৩০ বর্ষ, সংখ্যা ৩০৬, ঢাকা, ২০ চৈত্র, ১৩৮৭।

২৫। বেগম, সালেহা; তদেব, পৃষ্ঠা-২৭।

২৬। Billington, M. F.; Women in India, London, 1895, page-93.

২৭। Hussain, Sahanara; The Role of Bengal Muslim Women in the 19th and 20th centuries, UNESCO, Paris, 1985, page-3.